নিয়তি নাট্য মন্দির

অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

হুগলী-চুঁচুড়ার আদিকালের নাট্যচর্চা, নাট্যমঞ্চ ও নিয়তি নাট্য মন্দির (কৈরী টকি)

সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্বস্থলে নাটকের আদর সমান।।
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী নিবাসি।
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাসী।।

অথচ বিপুল পরিশ্রমে বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান সংকলন করতে গিয়ে শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য শুধু কলকাতার কথা যতো যত্ন করে লিখেছেন, ততোটা করেননি মহানগরীর বাইরে পশ্চিমবাঙলার নাট্যসচেতন আর কোনও নগর বা গ্রামের প্রতি। তবে শুধু শ্রী ভট্টাচার্যের প্রতি দোষারোপ করে তো লাভ নেই, জাতিরূপেই বাঙালি আত্মবিস্মৃত।

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা যায় হুগলী-চুঁচুড়ার নাট্যোৎসাহ আঞ্চলিক মাত্র নয়। কারণ যে বিদেশীদের প্রবর্ত্তনায় কলকাতা থিয়েটার প্রথম আবির্ভূত, সেই বিদেশীরা কলকাতায় কায়েম হওয়ার আগেই বাণিজ্য ও সংস্কৃতিচর্চায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অঞ্চলে তাদের জীবনধারার পরিচয় রেখে গেছেন। মুঘল আমলে নাটকের চর্চা ছিল না ঠিকই, কিন্তু সঙ্গীত, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল। মুঘল আমলেই সপ্তগ্রামকে ঘিরে হুগলী-চুঁচুড়ার মতো গ্রাম নগর-সভ্যতায় রূপান্তরিত। তাই ক্রমক ধারায় পর্তুগীজ, ডাচ ও পরে ইংরেজদের মতো বিদেশীদের সান্নিধ্যে এই অঞ্চলবাসী আসতেই বিদেশী শিল্পবোধ ও শিল্পরীতির প্রয়োগ কৌশল তাদের প্রথমাবধি আকৃষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার যে ১৫৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাদশাহ আকবর পর্তুগীজ পেড্রো টাভারেস্ -কে ফরমান দিয়েছিলেন, তার জোরেই হুগলীতে পর্তুগীজদের কুঠি, দূর্গ, বাণিজ্য, বসতি গড়ে ওঠে। পরবর্তী বাদশাহ শাহ্জাহানের ফরমানের জোরে প্রথমে ডাচ বা ওলন্দাজ ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে পরে ইংরাজ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী বন্দর গড়ে নিজেদের ওই বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত করে। মাঝে ১৭৯৫-এর ২৮ শে জুলাই থেকে ২০ নভেম্বর, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি চুঁচুড়ার অধিকার ইংরাজদের দখলে ছিল। পরে স্থায়ীভাবে ১৮২৫ -এর ৭ মে চুঁচুড়ায় ইংরাজরা কায়েম হয়। এই ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রায় দুশো বছর ডাচ বা ওলন্দাজদের উপনিবেশ চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই "১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দেরও আগে কলকাতার লালবাজারে উত্তর-পূর্ব কোণে" না কি ডালহৌসি স্কোয়ারে কলকাতার প্রথম নাট্যমঞ্চ "দি প্লে হাউস এনহ ডানসিং হল" -ওর থেকেও চুঁচুড়ার প্রথম রঙ্গমঞ্চ "ডাচ ডান্সিং হল" কালের বিচারে প্রাচীনতর। ওটিই সম্ভবতঃ অবিভক্ত বাংলার প্রাচীনতম নাট্যমঞ্চ। অথচ দুঃখ জাগে কলকাতার বাইরে বাঙলার নাট্যচর্চার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত না করায় গবেষক ও অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" রচনায় চুঁচুড়ার নাট্যমঞ্চ 'ডাচ ডান্সিং হল' এর উল্লেখ না করে লিখেছেন , "আবার কলকাতার বাইরে যেখানে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইংরেজ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, সেখানেও একটি করে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে চন্দননগর থিয়েটার (১৮০৮), চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩), দমদম থিয়েটার (১৮১৫) সাঁসুচি থিয়েটার (১৮৩৯) প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল"। বলাবাহুল্য, চন্দননগরে কখনো স্থায়ী ইংরেজ কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি। আর সাঁসুচি থিয়েটার ও চৌরঙ্গী থিয়েটার কি 'কলকাতার বাইরে'? অবে শুধু অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় একা নন, হুগলীতে আদিনিবাস হলেও স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'কলিকাতা ও মফস্বলে অন্যান্য অভিনয়' প্রসঙ্গে সামান্য কিছু চুঁচুড়া প্রসঙ্গের উল্লেখ করলেও কলকাতা-মনস্কই থেকেছেন। চুঁচুড়ার ডাচ হান্সিং হল-এর নামটুকুও লেখেন নি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের 'লীলাবতী' নাটকে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথা ছাড়া তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী চুঁচুড়ার নাট্যচর্চা-প্রসঙ্গে একটি কথাও লেখেন নি ঋিভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত পুস্তকটিতে।

সেই কবে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর শনিবার মধুসূদন সান্যালের (কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঘড়িওয়ালা বাড়ীতে)

ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় নাট্যমঞ্চ খোলা হয়েছিল। সেই বাঙলা সাধারন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার অষ্টবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৭ই ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে এক জনসভার প্রচারের উদ্দেশ্যে আহ্ব ায়করূপে সেকালের প্রখ্যাত নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি 'বসুমতী' সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখেন। সেটি ২৯শে নভেম্বর, ১৯০০ তে ঐ পত্রে প্রচারিত হয়। সেটির অংশবিশেষ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পাঠকের দরবারে বিস্মরণ মে াচনের জন্য উল্লেখ করা থাক " - নাট্যশালায় সভ্যজাতির গৌরবসূচক তিনটি প্রধান কলাবিদ্যা, — সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার একত্র সমাবেশ হয়। চেষ্টা থাকিলে, জাতি উন্নতি প্রয়াসী হইলে এই তিনটি কলার একত্র উন্নতি এই এক প্রতিষ্ঠ ান হইতে করিয়া লইতে পারে, বাঙ্গালী ততটা উদ্যোগী কবে হইবে তাহা জানিনা। -য়ুরোপীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে একাল পর্যন্ত তাহার উন্নতির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস যখন আছে, তখন অনুকরণপ্রিয় আমরা আমাদের এই শিশু নাট্যশালার একটা ইতিহাস রাখিয়া না যাই কেন?"

নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে যেমন, নাটক মঞ্চস্থ করার কাজেও কলকাতার অদূরে বর্তমানে বৃহত্তর কলকাতার অংশবিশেষ চুঁচুড়ার স্থান সবার আগে। বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাটক-প্রসঙ্গে গবেষণার পথিকৃৎ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ বইটিতে 'এ'দেশের াখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের ঘটনাবলীর ইতিহ াস'১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "এতদিন কলিকাতার যে-সকল নাটকে অভিনয় হইয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে সমাজ সংস্কারের অ ান্দোলন আরম্ভ হওয়াতে তখন হইতে নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা হয়। যতদূর জানা যায়, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এইরূপ সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্ট াব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। ইহার পর অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতায় ওই নাটকটির আরো দুইবার অভিনয় নয় — একবার রামজয় বসাকের বাড়ীতে, তাহার পর গদাধর শেঠের বাড়ীতে। গদাধর শেঠর বাড়ীতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ এই নাটকের তৃতীয় অভিনয় হয়। - ইহার পরে ৩ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়।" ওই অভিনয়ের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ ব্রজনাথ চন্দ্র — যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় হুগলী-চুঁচুড়া পুরসভা কামারপাড়া রোডের পশ্চিম পাশে দুটি গলির নামকরণ করেছেন। সভাপতি ছিলেন ভগবতীচরন ল াহা, যাঁদের আদি নিবাস চুঁচুড়ার চাঁপাতলায় এবং পরবর্ত্তীকালে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন নিমাইচরণ শীল, ব্যবস্থাপক রামচন্দ্র দীক্ষিত এবং আরো অনেকে।

প্রায় দেড়শো বছর আগে চুঁচুড়ায় সেই নাট্যাভিনয় কেমন হয়েছিলো? 'দেহপট সনে নট সকলি মিলায়ে'? না, নটেরা র ূপ হারিয়ে অরূপ, সান্ত থেকে অনন্তে মিলিয়ে গেলেও সেই অভিনয় সন্দর্শনের অভিজ্ঞান-কথা জানা যায় বাঙলা ন াট্যচর্চায় সেকালে যশস্বী চুঁচুড়াবাসী 'পিতা-পুত্র' গ্রন্থে গঙ্গাচরণ ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জীবনকথা রচনায় " - এই সময়ে মহা ধুমধামে চুঁচুড়ার "কুলীন কুলসর্বস্ব" নাটকের অভিনয় হইল। তখন কলকাতায় নাটক আরম্ভ হয় নাই। প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল। — 'অধীনিরে গুনমনি পড়েছে কি মনে হে?' গ্রন্থকার রামনারায়ণের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, তাঁহার নান্দী, নাপ্‌তে বউয়ের পরিচয় ও তিনরূপ পয়ারের লক্ষণ প্রভৃতি মুখস্তই করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ফলার এখনও ভুলি নাই।" হরিণাভির সুবিখ্যাত পন্ডিত রামনারায়ন তর্করত্ন এই সামাজিক ন াটকটিতে কুলীনরা বহু বিবাহে নিরত থাকায় সমাজে যে গ্লানি পুঞ্জিভূত হয়েছিলো, তাই তুলে ধরেছিলেন। কলকাতার ক ালচারে খ্যাত 'চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রূঁপচাদ পাক্‌সী উক্ত নাটকের জন্য কয়েকখানি সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন।' সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা পুনল্লিখিত হয়েছিলো।

কলকাতায় এই নাটকের যে তৃতীয় অভিনয় হয়, সে সম্পর্কে জানা গেছে "বড়বাজারস্থিত ওই রঙ্গভূমি প্রায় ছয়-সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত ব াবু কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গন আগমন করিয়া সভামন্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন।" চুঁচুড়ার নাট্য ানুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার ৯ই জুলাই, ১৮৫৮ সংখ্যাটিতে জানানো হয় "অভিনয় প্রদর্শন অতি সুচারূপে

হইয়া গিয়াছে। নয়শত দর্শক সভাকে শোভায়মান করিয়াছিলেন।" দুটি অনুষ্ঠানের তুলনামুলক বিচারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, চুঁচুড়ার মত একটি দেড় বর্গমাইল সীমায়িত সেকালের মফঃস্বল শহরে যে দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা ন-শো হতে পারে, তা ছিলো মহানগরী কলকাতার পক্ষেও দুর্লভ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে ১৮৭৬-এর ২৬শে জুলাই তা রিখে কলকাতার এলবার্ট হলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রথম যে সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় বাগী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বদেশানুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে, তাতে সমবেত শ্রোতার সংখ্যা সাতশোর বেশী ছিলো না। অথচ চুঁচুড়ার এ ন াট্যনুষ্ঠানের এরও আঠারো বছর আগেকার কথা। এর থেকে এ কথাও প্রমানিত হয় যে, সেই নাটকাভিনয়ের মান নিশ্চয় উন্নত ছিলো। তা না হলে এতো দর্শককে কখন আকৃষ্ট করতে পারতো না। অন্য বিচারে এ কথাও বলা চলে যে সেকালে এই শহরের দর্শকসমাজের রস-চি-বোধও নিশ্চয় কম ছিলো না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই নাটকটিই চুঁচুড়ার শীলগলিতে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত নীলাম্বর শীলের বাড়ীতে (বর্তমানে 'বড়ো শীলের বাড়ি' নামে সুপরিচিত) স্থানীয় 'গৌরাঙ্গ নাট্যসম াজ' আবার মঞ্চস্থ করেন।

কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি-নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র ভাগীরথী নদীর অপর পারে চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজের ছাত্রজীবন (১৮৪৯-৫৬) এবং প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পরে বর্ধমান ডিভিশন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে কর্মজীবন (১৮৭৬-৮১) যাপনকালে চুঁচুড়াবাসী আরো অনেকের সঙ্গে পিতা-পুত্র গঙ্গাচরণ ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে পরিচিত হন। সাহিত্য ও নাটকচর্চায় ওদের সমান আগ্রহ। তাই এঁরা সহযোগী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ তারিখে, গুড ফ্রাইডে-র ছুটিতে শ্যামবাবুর ঘাটের কাছে প্রসিদ্ধ মল্লিকবাড়ীতে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এঁদের উদ্যোগে অভিনীত হয়। এঁদের সঙ্গে ছিলেন দীননাথ ধর (১৮৪০ - ?) তাঁর সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন , "আম াদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন; তিনি আমাদের অভিনয় সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহার গান-শক্তিও বেশ ছিলো। এই অভিনয় প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন "বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্ত্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিমবাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মদের অবস্থার প্রলাপ-দৃশ্য বস াইয়া দেন। আর টুকরা টুকরা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধুবাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জা নিয়া, বলিয়াছিলেন যে "এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিমভাই, অ ার, অক্ষয় ছেলে, তাহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।" চাকুরী-জীবনে যশহরের বঙ্কিমের সঙ্গে দীনবন্ধুর পরিচয় হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭২ এ বঙ্কিমচন্দ্র, গঙ্গাচরণ ও অক্ষয়চন্দ্র কর্মসূত্রে মিলিত হন বহরমপুরে। সেখ ানে "তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর — সাহিত্যচর্চার যেন বান ডাকিয়াছিল।" চুঁচুড়ায় লীলাবতীর অভিনয় আয়োজন সেই সময়ের কথা।

স্থান-কালের কথা হলো। এবার অভিনয়ে শ্রোতাদের কথা। অক্ষয়চন্দ্র জানিয়েছেন, "কলিকাতা হইতে দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্যগণ, কাঁঠালপাড়া হইতে সঞ্জীববাবু (বঙ্কিমচন্দ্রের মেজ ভাই — লেখক), আমাদের স্বগ্রামের মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শূরবীর রথীগন শ্রোতা। ..... বাগবাজারের নীলদর্পনের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।" তবে দুঃখের কথা, লীলাবতী নাটকটির মহল ায় বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত থাকতেন তবু কি এক অজ্ঞাত কারণে তিনি "গুড ফ্রাইডে' - ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন নাই।

অভিনয় হলো। শ্রোতাদের প্রতিত্রিয়া কি হলো? তাও জানিয়েছেন সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র "দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়েরা ত দূই হাতে দুই পায়ের ধুলা লইয়া, মহা আনন্দে মহা আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, 'যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটা দ্যাখলাম।'

পরবর্তী ৪ এপ্রিল তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-তেও এই অভিনয়ের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ত ার অংশ বিশেষ - চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ..... অভিনয়টি অতি সূচা পূর্ব্ব হইয়া ছিল। আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয় নাই, তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ওটি একটি।" অক্ষয়চন্দ্র অভিনয়ের উদ্যোক্তা হয়েও অ াত্মসমালোচনায় স্বীকার করেছেন "সে রাত্রিতে আমাদের কিছু অসম্পুর্ণতা ছিল।"

সেকালের প্রখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল বসু ২৬ -এ ফাল্গুন, ১৩২২ (অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ) -এ "পুরাতন প্রসঙ্গ" -এ জানিয়েছেন, "একদিন রসিক নিয়োগীর ঘাটের বৈঠকখানায় আমি একাকী বসিয়া আছি, এমন সময় তিনটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলো না, — "

এই সাক্ষাৎকারে যে কথোপকথন হয়, তার কিছু অংশ জানা এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত

" ..... আমাদের তুমি চিনতে পারছ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর ইনি প্যারীমোহন রায়।"

" আমি তৎক্ষনাৎ শিশিরবাবুর পদধুলি লইলাম, অক্ষয়বাবুকে ও প্যারীমোহনবাবুকে নমস্কার করিলাম। ....."

"তুমি কি সাজবে?"

"সৈরিন্দ্রী।"

"..... তুমি সৈরিন্দ্রীর পার্টটা একটু আমাদের শোনাবে?"

"আমি একটু ইতস্তত করিয়া সম্মত হইলাম। আমি জানতাম চুঁচুড়ায় সরকারের দল 'লীলাবতী'র রিহার্সাল দিয়াছিলেন; তখন আমাদের সখের দলে 'লীলাবতী' হইয়াছিল। অক্ষয়বাবুর নাম শুনিয়াই আমার মনে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল; এ সময়ে আমাদের হাতের তাস কি দেখান উচিত? যাহা হউক ....."

"আমি নবীন মাধবের মৃত্যুসজ্জার পার্শ্বে সৈরিন্দ্রীর অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।"

আর বাঙলা নাটক বিশেষজ্ঞ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন " ..... যখন সংবাদ আসিল দেশমান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ার একক নাট্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়া লীলাবতীর মহলা দেওয়া হইতেছে, তখন অর্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, চুঁচুড়ার দলের কাছে হেরে যাব আর তুমি বসে তাই দেখবে?' নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ, ধর্মদাস ও অর্ধেন্দুশেখর গেলেন গিরীশচন্দ্রের কাছে। ....."

চুঁচুড়ার এই উদ্যোগই সম্ভবতঃ গিরীশচন্দ্র আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলো 'ন্যাশনাল থিয়েটারে আর গিরীশচন্দ্রের যোগদানে শক্তিশালী এই 'কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েট্রিকাল সোসাইটি' পরে 'অবিভক্ত বাঙলার প্রথম সাধারন নাট্যশালা' নামে স্বীকৃতি লাভ করলো। চুঁচুড়ার নাট্যপ্রয়াসীদের পরোক্ষ প্রভাব এ ঘটনায় প্রতিফলিত।

চুঁচড়ায় অভিনীত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' ও 'লীলাবতী' নাটকদুটি একাধিক রজনী সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হলেও অভিনয়ে অংশগ্রহনকারীদের পরিচয় জানা যায় না। এই অভাববোধে ক্ষুণ্ণমনে বাঙলা নাটক বিষয়ে সুপন্ডিত ডক্টর অমিতকুমার ঘোষ বাঙলা অভিনীত সেকালের নাট্যচর্চা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন, তা অনুধাবনযোগ্য "অভিনয়ের ভূমিকা লিপি নাটক এ অভিনয়ের আলোচনার পক্ষে যে কতখানি প্রয়োজনীয়, অনেকেই তা উপলব্ধি করতে পারেন না, শুধু কেবল একটি দু'টি ভূমিকা নয়, সমগ্র ভূমিকালিপি সংরক্ষন করা গবেষণার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।"

নাটকে — বিশেষত সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালীর নাটকে-সঙ্গীত একটি বড়ো ভূমিকা পালন করে। যাত্রায় যেমন নিয়তি ও বিবেক চরিত্ররূপেই আসরে উপস্থিত থাকে, তেমনটা নয় — চরিত্রের পরিস্ফুটনে শিল্পবোধ অক্ষুন্ন রেখে নির্বাচিত পাত্র-পাত্রীর মুখে গান প্রযুক্ত হয়। 'লীলাবতী' নাটকে গান প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র (১৮৪৬-১৯১৭) লিখেছেন "এই অভিনয় রঙ্গে ৭/৮ টি গান ছিলো; দুই একটি আমার কৃত। আর অনেকগুলি সঞ্জীববাবুর (১৮৩৪ - ১৮৮৯) রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং অমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

পিলু, যৎ।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখিজল, কত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা ভারে — ত মরে কে করে বিহিত তার?

এই নাটকের সঙ্গীত-কথায় আরও লিখেছেন — ..... "তখন থিয়েটারে "কীর্ত্তন" প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরীসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম —

কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই ?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঙে, ও তার নুপুর বাজে,
ঐ নুঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই।

সঙ্গীতে — বিশেষভাবে গানটির প্রতিত্রিয়ার কথায় তিনি জানিয়েছেন "এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। প াউন্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিতজীবন মহারাজকে। দুর্গাচরণ লাহা (১৮২২ - ১৯০৪)। প্রথমে চুঁচুড়া চাঁপাতলাবাসী, পরে কলকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বসবাস করেন। — লেখক সকলে কঠোরপ্রান বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল।"

সঙ্গীত রচনা ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে তাঁর অতৃপ্তির কথা জানিয়া লিখেছেন " — ললিত লীলা, বতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটা ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া

আয় আয় মকর গঙ্গাজল !
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গ লতা, কোথা গো উর্বশী কোথা —
ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচব ঝমঝমাইয়ে মল

"এইরূপ একটা গান করিয়া, সেদিনের আসর রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম।"

কিন্তু নাটক যে বিচিত্র শিল্প, তার অন্যতম আঙ্গিক রূপে সঙ্গীতের বাণী ও সুর যে নাটকীয়তার আবহ গড়ে তোলায় সহযে াগী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শিল্পচিসম্মত হওয়া দরকার — সে বোধ অক্ষয়চন্দ্রের ছিলো। তাই তার অতৃপ্তি বোধ — 'তবু ভরিলোনা চিত্ত'! কান রচনায় এই অতৃপ্তি বোধে তিনি তার 'সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব' গঙ্গাচরণ সরকারের শরণাপন্ন হলেন। সাহিত্য ও নাট্যচর্চায় পিতা-পুত্রের ওমন সুনিবিড় ও সহৃদয় সম্পর্ক দুর্লক্ষ। চুঁচুড়ার এ পিতা ও পুত্র দৃষ্টান্তস্বপ। সে যা হোক, "পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রসপিরের উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্ বীকৃত হইলেন। কিন্তু "পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন।" সুখের কথা, "তার পরদিন পৌছন পত্রের সঙ্গে গান আ সিল। পিতা গাড়ীতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তাল —

আজি কি সুখের উদয় !
লীলার সঙ্গে ললিতের আজ দিলাম পরিণয়।।
দুখ-তম তিরহিল, সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়।
যদি সব সভা-জন, লই সুখে সুখি হন,
বুঝিব সফল শ্রম, সফল আশয়।।

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে আমরা এই গাহিয়া মাত্ করিয়াছিলাম।"

এসব উদ্ধৃতি থেকে পিতা ও পুত্রের নাট্যমনস্কতা, নাটক সম্পর্কে, বিশেষভাবে নাটকের গান রচনায় আপন আপন দক্ষত ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া নাটকের গানে অক্ষয়চন্দ্র যে গায়ক ছিলেন, সে কথাও জানা গেল। চুঁচুড়ায় নাট্যচর্চার পরিবেশ সেকালে নিষ্প্রাণ ছিলো না।

শুধু তাই নয়, নাটক সম্পর্কে আলোচনামুলক প্রবন্ধ 'নাটকের সৃষ্টিকাল', 'নাটক — আধুনিক বাংলা নাটক' রচনা করেছেন এবং অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া থেকে তাঁর সম্পাদিত 'সাধারনী' পত্রিকার ৯ম ভাগে, ১৫শ সংখ্যায় ১৮৭৭ -এর ১ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'রাম' ও 'মেঘনাদ' পরস্পর বিরোধী এই দুই ভূমিকার অভিনয় সম্বন্ধে" আর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ই জানুয়ারী 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের সামগ্রিক সমালোচনা করেছেন ২০ জানুয়ারী, ১৮৭৮-এ প্রকা শিত ঐ পত্রিকায়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর গিরিশচন্দ্র ঘোষ- স্মারক বক্তৃতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন " আর গঙ্গাচরণ সরকার ঢাকা কলেজ ভবনে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮৭৮ - ৭৯ খৃষ্টাব্দে) 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভ

াষা বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ..... তিনি "দৃশ্যকাব্য অথবা নাটক আলোচন
ারম্ভে লিখিয়াছেন "বঙ্গভাষায় পূর্বে কোন দৃশ্যকাব্য দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গভাষায় বহুকাল হইতে বহুবিধ যাত্রা অভিনীত হইয়া
আসিতেছে বটে, কিন্তু সে সকল যাত্রা কোন রচিত নাটকের অভিনয় নহে এবং তত্তাবৎ কোন নাটকের নিয়মে অভিনীত হয়
না। বঙ্গভাষায় নাটক রচনের চেষ্টা প্রথম ভারতচন্দ্র করিয়াছিলেন — সে যাহাই হউক, মান্যবর রামনারায়ন ভট্টাচার্য্য
মহাশয়ের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক বঙ্গরঙ্গভূমিতে প্রথমেই অভিনীত হইয়াছিল; ..... আমার বিবেচনায় দীনবন্ধুব
াবুর বিরচিত নাটকাবলীর মধ্যে 'লীলাবতী' সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বোৎকৃষ্ট ..... " তাঁর ওই মতামত যথেষ্ট গুত্ব লাভ
করে। তা ছাড়া নাটক রচনা সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেন, তা সুবিবেচিত, যুক্তিপূর্ণ —
"নাটক রচনা অতি কঠিন কার্য্য; কেবল কতগুলি নরনারীর কথোপকথনে নাটক হয় না, ইহাতে গ্রন্থকর্তা নিজে কথা কহেন
না, অথচ তাঁহাকে কোন ঘটনাঘটন, কিম্বা কোন নৈসর্গিক দর্শন অথবা কোন নরনারীকে চরিত্র বা অন্তর্ভাব এরূপে দেখ
াইতে হইবে যে, যেন তাহা প্রকৃত অথচ চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী হয়। ..... এবং যাঁহার রচনাশক্তি সূনিপুন ও কৌশল
শক্তি অসাধারশ, তিনিই যথার্থ নাটক রচয়িতা হতে পারেন ..... এরূপ কবি বঙ্গসাহিত্যে অদ্যাপি কেহ অবতীর্ণ হয়েন ন
াই। ফলতঃ এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় যত নাটক হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রকৃত নাটক একখানিও নাই, কিন্তু ভরসা করি অবিলম্বে
এই অভাবের অপনয়ন হইবে।"
আশাদরদী গঙ্গাচরণ সরকার। কিন্তু তাঁর সে আশা আজও পরিপূর্ণ হয় নি। হুগলী মোলঘাট নিবাসী হরচন্দ্র মোদকের
অনুদিত 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ১৮৫৩ -এ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নামে প্রকাশিত। নীলাম্বর শীলের অধস্তন চতুর্থ পুষ নিম
াইচাঁদ কাব্য, গল্প ছাড়াও নাটকও রচনা করেন। তাঁর লেখা 'ইলাবতী' সেকস্‌পিয়ারের 'এ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' অবল
ম্বনে রচিত। চুঁচুড়ার এই শীল বংশে আর একজন সাহিত্যচর্চায় ও নাটক রচনায় সেকালে সুনাম অর্জন করেন। তিনি
গৌরমোহনের পুত্র নিমাইচাঁদ শীল। 'ধ্রুবচরিত্র' (১৮৭২) 'তীর্থমহিমা' (১৮৭৩) নামে দুটি সংস্কৃত ভাষায় নাটক ছাড়া চ
ারটি বাঙলা নাটক ও প্রহসন রচনা করেছিলেন। 'নীলাম্বর ঠাকুর', 'কাদম্বরী' (১৮৬৪), 'চন্দ্রাবতী' (১৮৬৯) এবং এঁরাই
আবার বড়লোক' (১৮৬৭) শিরোনামে নাটক চারটি পরিচিত। শীলগলির এই বাড়ীতে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে নাটক
রচনা ও অভিনয়ের আয়োজন করার কথাও জানা যায়। কামারপাড়ার ক্ষেত্রনাথ শীলকে ব্যঙ্গ করে লেখা প্রহসন 'হঠাৎ
বাবু' মঞ্চস্থ হয় সেই ১৮৭২ -এ।

ডাচ দুর্গ ভেঙে ইংরেজদের তৈরী 'বারিক হলে' ১৮৭৩ -এর ১৩ই সেপ্টম্বর কলকাতার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার দল
দুটি নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'যেমন কর্ম তেমন ফল' ও 'মোহান্তের এই কি কাজ' মঞ্চস্থ করেন। "শেষের পালাটি
লক্ষীনারায়ন দাসের রচিত"। নাটকটি তারক্ষেরের মোহান্তের অবৈধ প্রণয় প্রসঙ্গ নিয়ে 'দেশমের তুমুল আন্দোলন' -এর
প্রতিত্রিয়া। অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণে ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচুড়ায় গিয়া 'মোহান্তর এ কি কাজ' অভিনয় করিয়া
আসিলাম। এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, নগেন, নবীন সাজিলেন; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।" নাট্যচর্চায়
তখন কলকাতার সাথে চুঁচুড়ার এমনই দেওয়া নেওয়ার পালা। এ খবরটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সে বছরে ১১ ও
১৩ সেপ্টম্বর Amrita Bazar Patrika এবং Indian Mirror-এ প্রচারিত হয়।

১৮৮২ -এর ২৮ অক্টোবর সমস্ত গোঁড়ামী থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে চুঁচুড়ার নাট্যোৎসাহীরা দীনবন্ধু মিত্রের আলোড়ন
তোলা নাটক 'সধবার একাদশী' — যাকে নাট্যসমালোচক গঙ্গাচরণ সরকার বলেছেন 'প্রহসন মধ্যে - অতি মনোহর।"
সেটি মঞ্চস্থ হয় তাঁদেরই অন্তত সাত-আট পুষের ওলন্দাজি চুঁচুড়ার বাহিরে গঙ্গার ধারে' কনকশালি কদমতলার বা
ড়িটিতে।
বাঙলা নাটকাভিনয় ও নাটমঞ্চের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষন করলে মহানগরী কলকাতা এ বর্ধমান বিভাগীয় সদর চুঁচুড়ার
মধ্যে এক অন্তরঙ্গ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হুগলী নিবাসী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় 'প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা
বিদেশীদের কীর্ত্তি'। কলকাতায় "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডফ নামে এক শদেশবাসী .....
২৫ নং ডুমতলাতে (বর্ত্তমানে এজরা ষ্ট্রীটে) এক নাট্যশালা স্থাপন করেন।" অনুপভাবে সেকালে চুঁচুড়ার বড়ালবাগানে

সম্ভবতঃ ডাচ্ ডান্সিং হল। দুটিই বিলুপ্ত।
ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বাঙালী কতৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১)। শেক্সপীয়েরের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অংশবিশেষ এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত। তেমন কোন নাট্যশালার সন্ধান চুঁচুড়াতে না মিললেও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কনকশালির মহেন্দ্র বসুর (বর্তমানে লুপ্ত) বাড়ীতে সেই জুলিয়াস সিজর অভিনীত হয়। কনকশালী নিবাসী অধ্যাপক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এন্টনি এবং কদমতলা-নিবাসী রজনী ভাদুরী হেলেন-এর ভূমিকায় ইংরেজি ভাষায় অভিনয় করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্ররা শেক্সপীয়েরের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নামক নাটক অভিনয় করেন। সেই রূচির বিস্তারে চুঁচুড়াতেও ঐ নাটকটি অভিনয় হয়। রজনী ভাদুরীর পোর্শিয়া নারী চরিত্রে রূপদানের কথা এখনও এখানে স্মরণ করা হয়।
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে দেশপ্রেমের যে বন্যা আন্দোলনের রাজপথ আর আনন্দের সাজঘর বিধৌত করেছিলো তার মুলে অনেকখানি ছিল বাঙলা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) এমনই প্রথম নাটক। শ্যামবাবুর ঘাটে ছিলো বাঁধা স্টেজ। সেখানে এ নাটকটি সম্ভবতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

সেকালের বিখ্যাত নাটকগুলির প্রায় সবকটি এই শহরে অভিনীত হয়োছিল। মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১২), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫), অমৃতলাল (১৮৫৩-১৯২৯), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৮৬৩-১৯২৭) প্রমুখের জনপ্রিয় বাংলা নাটকগুলি চুঁচুড়ায় অভিনীত হয়। ১৯০৬ -এ চন্দ্রশেখর, ১৯০৯ -এ মেবারপতন (২ বার কনকশালিতে অক্ষয় সরকার ও মহেন্দ্র বসুর বাড়িতে), কৃপণের ধন, ১৯১৬ তে শ্যামবাবুর ঘাটে রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বঙ্গে বর্গী, নুরজাহান ১৯১৭ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে ডিউক ক্লাব (১৮??) প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' -ও ঐ সময় ঐ ডিউক ক্লাবে অভিনীত হয়েছিলো। চাঁদবিবি, কল্যানী, কাল পরিণয় নাটকগুলি মঞ্চায়ন হয় রায়ের বেড়ের রায় বাড়ীতে। খনা, বিরহ, মহানিশা ও পোষ্যপুত্র (চুঁচুড়াবাসী স্বনামধন্য ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবী (১৮৮২ - ১৮৫৮) -র উপন্যাস অবলম্বনে) আলমগীর, পান্ডব-গৌরব, জনা, যোড়শী, কর্ণার্জুন, শিবাজী, সাজাহান, বঙ্গনারী, আলিবাবা, দুর্গেশনন্দিনী — এই নাটকগুলি চুঁচুড়ার পাড়ায় পাড়ায় মঞ্চস্থ হয়। শ্যামবাবুর ঘাটের দুটি মঞ্চস্থানে বিভিন্ন নাটকের পরিচালনায় থাকতেন প্রফুল্ল হালদার।

নাটক রচনায় অক্ষয়চন্দ্র বা তাঁর পিতা গঙ্গাচরণ হাত না লাগালেও চুঁচুড়ার কয়েকজন উদ্যোগী ছিলেন। 'বড়ো শীল' পরিবারের নিতাইচাঁদ, নিমাইচাঁদের পর বহু পালা রচনা করেছিলেন 'ধন্বন্তরী' - শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকন্ঠ যোগ বিশারদ মহাশয়'। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তার পরিচয় হলো বাঙলা আধুনিক গানের যশস্বী কন্ঠশিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত (রায়) -এর পিতামহ তিনি। 'সপত্নী-সন্তাপ' — তাঁর এই পঞ্চরস পঞ্চসন্ধিপূর্ণ পৌরাণিক প্রকরণটির অভিনয় হয়েছিলো ১৯০৭ -এ মাধবীতলার হরেন্দ্রনাথ (?) মন্ডলের বাড়ি। সেকালের শ্লেষ-অনুপ্রাস-ভরা রচনারীতি কেমন অনায়াসে কবিরাজ রায় মহাশয় প্রয়োগ করেছেন তাঁর এই নাটকের এই গানে
অন্তর দুঃখ অন্তর করো, অন্তর্যামিনী শিবে
এ যাতনা বিনা শিবে কে বলো মা বিনাশিবে?
তাঁর রচিত 'পান্ডব গৌরব' (একই শিরোনামে গিরিশচন্দ্রের নাটকটি স্বতন্ত্র) সেকালের আর একটি জনপ্রিয় নাট্যগীতি। আর একজন চিকিৎসক বোসেরঘাট-নিবাসী ডাক্তার অমর চট্টোপাধ্যায় 'জহর ব্রত' নামে একটি নাটক রচনা করেন। চিকিৎসক ও নাট্যকার-রূপে কলকাতার ডাক্তার ভূবনমোহন সরকারের লেখা 'ডাক্তারবাবু' নাটকটির কথা মনে আসে। সেটি দি ইন্ডিয়ান ('লেট' গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিলো ৪ সেপ্টম্বর ১৮৭৫ -এ।

নাটমঞ্চের দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজসজ্জা চুঁচুড়াতে কেমন ছিলো, সে কথা জানা যায় না। যে সব সেকালের পরিভাষায় জানা যায় 'ঠ্যালা সীন', 'কাটা সীন', 'বক্স সীন', 'উইংস', 'কার্টেন', 'প্রোসেনিয়াম' — সেই সবের কথা কোনভাবেই কে

াথাও উল্লিখিত হয় নি। শুধু শোনা যায়, জনাই থেকে আসতেন দীনু মুখুজ্যে। তিনি দৃশ্যপট আঁকতেন; আবার ফ্লুট বাঁশিও বাজাতেন সমান দক্ষতায়।

অক্ষয়চন্দ্রের 'অভিনয় সমিতি' -সহ আরো কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠীর কথা জানা যায়। এঁরা মূলত সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ভুক্ত। পেশাদারী কেউ ছিলেন কি না জানা যায় না। এই গোষ্ঠীর মধ্যে মাধবীতলার 'গৌরাঙ্গ নাট্যসমাজ' (১৮৯৩-১৯০৫), হুগলী ঘুটিয়াবাজারের গড়ে ওঠা 'সুহৃদ সঙঘ' (১৯২৪-৩০)। এ ছাড়া ছিলো Officer's Club 1917, Freinds' Theatrical(১৮৩২-৩৬) মনসাতলার 'উৎসব নাট্যসমাজ' (১৯০৭-১৯১৮), 'সুহৃদ সম্মিলনী' (১৯২৫-১৯৩৫) এবং সমকালীন 'বীনাপাণি নাট্যসমাজ' রয়েছে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সংগঠনে ছিলেন গোপীজীবন অধিকারী, অমূল্য রায়, ভৈরবচন্দ্র দাস ও নলিন বসু। এঁদের আসর বসত মুন্সি (কেরী সাহেবের?) গলিতে। 'শঙ্করাচার্য', 'বঙ্গনারী', 'আহেরিয়া' ছাড়াও 'পান্ডব গৌরব' অভিনয়ে এঁদের সুখ্যাতি ছিল। তৃতীয়টির আসর ছিলো বলরামগলির শ্যামচন্দ্র মন্ডলের বাড়িতে। 'মহানিশা', 'ষোড়শী', 'আলমগীর', 'পান্ডব গৌরব' সুনামের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। পরবর্ত্তী দলটির আসর বসতো কামারপাড়া রোডের পূর্বমুখি মুখার্জিগলির বিহারীলাল মুখার্জীর বাড়ীতে। 'মন্ত্রশক্তি' অভিনয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুনাম অর্জন করেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবেন্দ্রনাথ মন্ডল। এতোদিন নারীচরিত্রে অভিনয় করতেন পুষেরা। রজনী ভাদুরী, নলিন বসু, শ্যাম মন্ডল ও কেশব পাল স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতেন। পরে দয়াময়ী নাট্যসমাজ বড়ালবাগানে স্টেজ ভাড়া করে প্রথম নারী চরিত্রের জন্য অভিনেত্রী নিয়ে পেশাদারী অভিনয়ে যুগান্তর ঘটান। এই বিষয়ে চুঁচুড়া পশ্চাদ্‌বর্তী । কেননা নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে বিদ্যার ভূমিকায় রাধামনি নামে এক ষোড়শী আগেই কলকাতার শ্যামবাজারে ৬ অক্টোবর, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনয় করেন।

হুগলী-চুঁচুড়ার অদিকালে নাট্যচর্চার কথা যতটা পাওয়া যায় তা সবিস্তারে মহানগরী কলকাতায় নাট্যচর্চার প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু তথ্যসহ উল্লিখিত। নাট্যমঞ্চের আদিকথাও সেভাবেই কথার ফাকে ফাকে জানানো হয়েছে। এখন আরও যেটুকু বাকী সেটুকু আর বাকি থাকে কেন?

বাঁধা স্টেজ ছিল বড়ালবাগানে, মাধবীতলায় আর শ্যামবাবুর ঘাটে। বাঁধা স্টেজে নিয়মিত অভিনয় হত বলে মনে করা যায়। 'বাঁধা স্টেজে অভিনয়' বললে তেমনটা মনে হয়। 'স্টেজ বেধে অভিনয় হতো' বলা হলে সাময়িক প্রয়োজনের জন্য উদ্যোগ বোঝাতো। মহানগরী কলকাতাতেও প্রথম যুগে স্টেজ বা নাট্যমঞ্চ বলতে ঐ বাঁধা স্টেজের কথাই বলেছেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। কলকাতায় শরৎচন্দ্র ঘোষ যে বাঁধা স্টেজে ঘোড়ায় চড়ে দেখা দিতেন, তা ছিলো মাটির নীচু নাট্যমঞ্চ। সিমেন্টের পাকা গাঁথনীর স্টেজ পরবর্তীকালের কথা। চুঁচুড়ার 'বাঁধা স্টেজগুলির কয়েকটি পাকা গাঁথনীর ছিলো বলে শোনা যায়। তবে 'ডাচ ডান্‌সিং হল' ওলন্দাজদের ঔপনিবেশিক আমলে কেমন ছিলো তা জানা না গেলেও ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধিত 'নিয়তি নাট্যমন্দির' প্রসঙ্গে বিশদে কিছুটা জানানো যায়। বিশদে — যেহেতু এই নাট্যমঞ্চের ইতিবৃত্ত নাটকীয় এবং এ বছরেই তার আশি বছর পুর্ত্তি।

''কাশীধামের ভেলুপুরা পল্লীর জীর্ন এক কুটিরে বিগত বাংলা ১২৮৬ সালের ১৪ই আষাঢ় শুত্রবার নিজের জন্মদিন জানিয়ে'' হিন্দীভাষী হয়েও যিনি বাঙলা ভাষায় ''স্মৃতিকথা'' রচনা করেছেন, প্রকাশ করেছেন আষাঢ়, ১৩৫৭ -এ, যার দাম ছিলো আট আনা, এখন অমূল্য, তিনি ''নিয়তি নাট্যমন্দির'' নির্মাতা। ১৩০৪ সালের ৪ঠা আষাঢ় পিতার হাত ধরে মিলার কোম্পানীর স্টিমার থেকে হুগলীর চাঁদনীঘাটে এসে'' নামেন যখন, তখন তাঁর বয়স আট। কখনো রাজমজুর, কখনো মুটে, কখনো দাস্যবৃত্তি, কখনো -বা জাতিতে সদ্‌গোপ হয়ে চাষবাস থেকে ময়রার দোকানের কর্মী। মালিক কিশোর মোদকের নির্দেশে তত্ত্ব নিয়ে যান কলকাতায় অবিনাশ মোদকের বাড়ী। তাঁর স্মৃতিকথা অনুসারে, ''মিনার্ভা থিয়েটারে'' 'নীলদর্পন' প্লে হইতেছিল। তাহার টিকিট না পাইয়া ক্লাসিক থিয়েটারে 'রাবণ বধ' প্লে দেখিতে গেলেন এবং আমাকেও আট আনার একখানি টিকিট কিনিয়া বসাইয়া দিলেন। সেইদিন আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, ''ভগবান তুমি যদি অর্থ দাও, আমিও একটি নাট্যগৃহ করিব''।

ময়রা দোকানের কর্মী থেকে তিনি হলেন মালিক। ধীরে ধীরে খাবারের দোকানের সঙ্গে ''একটি বিলাতী মদের দোকান, কেরোসিনের ডিপো' ইত্যাদির মালিক হলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে চুঁচুড়া পঞ্চাননতলা নিবাসী কালীচরন নন্দীর

কাছ থেকে ‘‘এক হাজার টাকা সেলামী, একশত পঁচাত্তর টাকা গাছের দাম, কুড়ি বৎসরের লীজ্ ও মাসিক খাজনা উনিশ টাকা’’ দিয়ে ‘‘সকালে আমি দেখিলাম ওখানে যে ডাচ ড্রেন ছিল, তাহা হইতে বহুকাল মাটি তোলা হয় নাই। সমস্ত স্থানটি বহু জঙ্গলাকীর্ন। আমি কয়েকজন সাঁওতাল নিযুক্ত করিয়া বিবিধ লতাগুল্ম, চোদ্দটি আমগাছ, একটি বেলগাছ, একশত পঁচিশটি সুপারী গাছ, একটি লেবুগাছ কাটাইয়া ফেলিলাম ও গুড়ি তুলিয়া স্থানটি পরিস্কার করিলাম।

‘‘ডিসেম্বর মাস অন্ধকার রাত্রি, তখন এগারোটা কি বারোটা হইবে ..... বাড়ী ফিরিতেছি। ..... কে যেন আমাকে অদৃশ্য হাতছানি দিয়া ডাকিল, ‘‘কি করবি?’’ সত্যই ত কি করিব। বসতবাটী করিবার উপায় নাই। সামনে ব্যারাক, তাহা ছাড়া, সন্ধ্যার পর এই রাস্তা জনমানবশূন্য থাকে । দোকানঘর করিলেও লোকজন বড় একটা আসিবে না, সেইজন্য চিন্তিতমনে বাড়ী ফিরিয়া গেলাম।

‘‘কয়েকদিন পরে হঠাৎ আমার স্মরণ হল শ্রীযুক্ত হারাধন দাস শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বড়াল প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ চারদিন থিয়েটার করিবার জন্য এক্জিবিশন কমিটিতে একুশ শত বাইশ শত টাকা দিয়ে থাকেন ..... ভাবিলাম ঐখানে একটি থিয়েটার হল তৈয়ারী করিতে পারিলে ঐ একুশ শত বাইশ শত টাকা আমার প্রাপ্য হইবে। অন্ততঃ পাঁচশত টাকা তো পাইব। সকালেই চুন সুরকী ইট প্রভৃতি আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। একজিবিশন আফিসের হরেনবাবু একটি ম্যাপ করিয়া দিলেন।’’ এ ‘স্মৃতিকথার লেখক ও নিয়তি নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠাতা গুচরণ কৈরী। তিনি আরো জানিয়েছেন, ‘অর্থাভাবের জন্য আমাকে শ্রী নীরোদবরণ পান্ডার নিকট ঋণও করিতে হইল। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ কে সি দে কমিশনার মহাশয় বন্যাপীড়িত দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে এই বিল্ডিং-এ একটি চ্যারিটি করিতে চাইলে বিল্ডিং নির্মানকার্য্য দ্রুতগতিতে সমাধা করিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইং ২২ সালের ৩০ শে ভাদ্র উদ্বোধন দিনে সহরের ভদ্রমহোদয়গণর সমক্ষে মিঃ কে সি দে মহাশয় ও শ্রী ব্রজবল্লভ রায়, কাব্যকন্ঠবিশারদ মহাশয় এই সৌধটির নামকরণ করিলেন, ‘‘নিয়তি নাট্যমন্দির।’’ মাঝে জুন, ১৯৩৭ -এ ৮০০ টাকা অগ্রিম, ২০০ টাকা মাসিক ৬ টাকা সাড়ে ১০ আনা চুক্তিতে লীজ বন্দোবস্তে চুঁচুড়া তোলাফটক ষষ্ঠীতলা নিবাসী প্রয়াত শিবু দাস এখানে বায়োস্কোপ দেখাতে থাকেন। সে সময়ে হলটির নামকরণ ছিল ‘‘বিজলী’’। ১৯৪০ এর দশকে ‘‘বিচিত্রা’’ নাট্যগোষ্ঠী পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, নাট্যরত্নের পরিচালনায় অপরেশ মুখোপাধ্যায়র ‘‘কর্ণার্জুন’’ নাটক ওখানে মঞ্চস্থ করেন। তখন ‘‘বিজলী’’ নামটিই ছিলো। ‘‘স্মৃতিকথা’’য় শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা গুচরণ ‘‘বিজলী’’ ও পরে ‘‘কৈরী টকি হাউস’’ নামে রূপান্তরের ইতিকথা লিখে যান নি।